প্রথম আলো

তারিখ ... ৩০-ডিসে-২০১২
পৃ: ১০ কলাম ৩

পাঠ্যপুস্তকে ভুল ■ গৌতম রায়

দোষ কি শুধু এনসিটিবির?

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এনসিটিবি প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলোর ভুল নিয়ে *প্রথম আলো* কিছুদিন আগে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মোটা দাগে ভুলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—এক. বানান, বাক্য গঠন বা ভাষাগত ভুল; দুই. তথ্যসংক্রান্ত ভুল ও তিন. অন্যান্য ভুল। সব ধরনের ভুলের জন্যই লেখক ও সম্পাদকদের দায়ী করা যায়; কিন্তু পাঠ্যবই রচনায় লেখক ও সম্পাদক ছাড়াও আরও অনেকে নানাভাবে জড়িত থাকেন। ভুলের দায়ভার তাঁদেরও কম নয়। পরিকল্পনাহীনভাবে 'কাজ করা এবং 'ফিনিশিং টাচ' না দেওয়ার যে সংস্কৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, পাঠ্যপুস্তকের নানা ভুল তারই প্রতিফলন মাত্র।

একটি বই লেখার পর তা সম্পাদনা করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি একটি শিল্পও বটে! প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এখানে সম্পাদনার বিষয়টি লেখক, কিংবা প্রকাশকদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি বলে বই সম্পাদনা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। পাঠ্যবই সম্পাদনা আরও দুরূহ কাজ, যেখানে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বইকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে হয়। এর মধ্যে বানান ও ভাষাগত দিক ঠিক করার পাশাপাশি তথ্যগত উপস্থাপনা কীভাবে হচ্ছে, তা দেখা জরুরি। বিশেষত যাদের জন্য পাঠ্যবই রচনা করা হচ্ছে, তাদের বয়স, মানসিক বিকাশ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক দিকনির্দেশনা ইত্যাদি বিষয় ধারণ করে সম্পাদনা করতে হয়। এনসিটিবির পাঠ্যবই যাঁরা সম্পাদনা করেন, তাঁরা এ বিষয়গুলো ওয়াকিবহাল বলে মনে করি।

এনসিটিবিকে কীভাবে আরও দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়, সেই সিদ্ধান্ত যাঁদের ওপর, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় না এনে শুধু প্রতিষ্ঠানটিকে দোষারোপ করা কাজের কথা নয়

প্রশ্ন, তাহলে বইয়ে এত ভুল কীভাবে থেকে গেল? উত্তর পাওয়া যাবে, যদি জানা যায় এনসিটিবি কোন প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবই তৈরি করে। প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী বই তৈরির জন্য লেখক ও সম্পাদকেরা যে পরিমাণ সময় পেয়েছেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। তার মানে, একধরনের পরিকল্পনাহীনতা থেকে কিংবা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে এনসিটিবি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিল। যে বই লাখ লাখ শিক্ষার্থীর কাছে যাবে, তাদের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে বইগুলো তৈরি করা হলো না কেন?

বর্তমান সরকার শিক্ষা নিয়ে বেশ কিছু প্রশংসনীয় কাজ করেছে, যার মধ্যে বছরের প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছানোর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এটি নিশ্চিত করতে গিয়ে যে তাড়াহুড়ো করা হয়েছে, তার তিক্ত প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর নিশ্চিতভাবেই পড়বে। কিছুদিন আগে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সে কারণেও নতুন বই প্রবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে পাঠ্যবই, পাঠ্যসূচি, শিক্ষাক্রম ইত্যাদির পরিবর্তন তাড়াহুড়োর বিষয় নয়।

আমাদের দেশে যেভাবে পাঠ্যবই রচনা করা হয়, সেই প্রক্রিয়াটিতে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। প্রথমত, লেখকদের যেভাবে কম সময় দেওয়া হয়, তা পাঠ্যবই রচনার উপযুক্ত নয়। পাশাপাশি বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় লেখক ও সম্পাদক নির্বাচন করা হয়, সেগুলোতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। যাঁরা বই সম্পাদনা করবেন, তাঁদের প্রয়োজনে বই সম্পাদনার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, নির্ভুল পাঠ্যবই রচনা করার উদ্দেশ্যে ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে টিম গঠন করা প্রয়োজন, যাঁরা সম্পাদকের পাশাপাশি বইগুলোকে ভাষাগত ও শিক্ষাগত নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তা লেখক ও সম্পাদকদের সঙ্গে কাজ করবেন। তৃতীয়ত, বইয়ের তথ্যগত বিষয় যাচাইয়ের লক্ষ্যে এনসিটিবির একটি বিশেষায়িত গবেষণা টিম কাজ করতে পারে, যারা প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি তথ্য নানাভাবে যাচাই করবে। অপর একটি গবেষণা টিম একই সঙ্গে বইগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য কতটুকু উপযোগী, তা গবেষণার মাধ্যমে যাচাই করে দেখবে, যেখানে দেশের শিক্ষাগবেষকেরা সরাসরি কাজ করবেন। চতুর্থত, উপর্যুক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার পর যখন খসড়া বই তৈরি হবে, তখন তা একটি পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে এক বা দুটো জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বইগুলোকে কীভাবে গ্রহণ করছে, কোনো অধ্যায় তাদের জন্য সহজ বা কঠিন কি না, বইয়ের ভাষার সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে কি না, বইয়ের ছবি কিংবা অঙ্কন-সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো ঠিকঠাক আছে কি না ইত্যাদি বিষয় উঠে আসবে। এক থেকে দুই বছরের পাইলট প্রকল্পের পরই কেবল সারা দেশে শিক্ষার্থীদের জন্য বই বিতরণ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীর জন্য শ্রেণীভিত্তিক ও প্রান্তিক যোগ্যতা কিংবা নির্দিষ্ট শিখনফল রয়েছে। পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহও এমনভাবে তৈরি হওয়ার কথা, যেখানে এসব যোগ্যতা ও শিখনফল যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। বইয়ে কতটুকু বানান বা তথ্যগত ভুল থাকল সেগুলো দেখা যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি শ্রেণীভিত্তিক ও প্রান্তিক যোগ্যতা বা শিখনফল কতটুকু বই ও শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটি যাচাই করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সামাজিক বিজ্ঞান* পত্রিকায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, পার্ট ডি) প্রকাশিত এই লেখকের একটি নিবন্ধ থেকে দেখা যায়, আগের বাংলা বইগুলোতে অধিকাংশ প্রান্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক যোগ্যতা পুরোপুরি বা আংশিক প্রতিফলিত হলেও অপ্রতিফলিত হওয়া যোগ্যতার সংখ্যাও কম নয় (রায়, আকবর ও গমেজ, খণ্ড ৩, সংখ্যা ৩, ডিসেম্বর ২০০৭ ও ডিসেম্বর ২০০৮)। আশা করা যায়, বর্তমান বইগুলোর রচয়িতারা এদিকে সতর্ক মনোযোগ রেখেছেন। তার পরও এ বিষয়গুলোর কথা মাথায় রেখে বর্তমান বইগুলো নিয়ে গবেষণা করা জরুরি।

এনসিটিবি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেখতে হবে, পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও এ-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এনসিটিবি নিজে থেকে কতটুকু সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং কী কী ধরনের সীমাবদ্ধতা প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে। এনসিটিবিকে কীভাবে আরও দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়, সেই সিদ্ধান্ত যাঁদের ওপর, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় না এনে শুধু প্রতিষ্ঠানটিকে দোষারোপ করা কাজের কথা নয়।

● **গৌতম রায়: প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা গবেষক।**
goutamroy@ru.ac.bd